সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা এবং জরুরী জ্ঞাতব্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

মুকাল্লিদরা (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) দু’টি বিষয়ে প্রতারিত হয়:[1]

জেনে রাখা ভাল যে, মুকাল্লিদরা দু‘টি ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ে থাকেন। তারা মনে করে যে, তাদের এ ধারণা সত্য। অথচ তা সত্য থেকে অনেক দূরে। এ ধারণা দু’টি আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত সাধারণ বাণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলেন:

﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না (ইউনূস-৩৬)।

রাসূল (ﷺ) বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অধিকাংশ ধারণা মিথ্যা হয় (বুখারী -৫১৪৩, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি)।

প্রথম বিষয়টি হলো: তারা ধারণা করে যে, তারা যে ইমামের তাক্বলীদ করে সে ইমাম আবশ্যই কিতাবুলস্নাহর সকল অর্থ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তিনি এটা ছাড়া অন্য কিছু ফাৎওয়া দিতে পারেন না। তারা এটাও ধারণা করে যে, তাদের ইমাম রাসূল (ﷺ) এর সকল হাদীস সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তিনি এছাড়া অন্য কিছু ফাৎওয়া দিবেন না। এজন্য যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস ইমামের মতামতের বিরোধী হয়, নিঃসন্দেহে তারা ধারণা করে যে, তাদের ইমাম এ আয়াত সম্পর্কে ও তার অর্থ সম্পর্কে অবগত এবং এ হাদীস ও তার অর্থ সম্পর্কে অবগত। তাদের ইমাম এ আয়াত ও হাদীসের চেয়ে আরও শক্তিশালী ও বিশ্বসত্ম দলীল অবগত, তাই তিনি এ আয়াত ও হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তাদের ইমামের কাছে কিছু ওহী মওজুদ আছে ভেবে ইমামের প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমতকেই তারা অগ্রগণ্য মনে করে। এ ধারণাটি মিথ্যা ও বাতিল। এতে কোন সন্দেহ নেই।

সকল ইমাম একথা স্বীকার করেছেন যে, তারা ওহীর সমস্ত প্রমাণাদী আয়ত্ত করতে পারেন নি। (ইনশা আল্লাহ্ এর বিবরণ সামনে আলোচনা করা হবে)।

এ বিষয়টি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। যিনি ছিলেন দারুল হিজরের ইমাম। যার মহৎ জ্ঞান, মহিমা ও অনুগ্রহে ‘‘মুওয়াত্ত্বা’’ সংকলিত হয়েছে। খলীফা আবূ জাফর আল-মানসূর যখন সকল মানুষকে শুধু মুওয়াত্ত্বায় সংকলিত সমস্ত হাদীসের উপর আমল করানোর জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) খলীফা আবূ জাফরের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে এমন জ্ঞান ছিল যা অন্যের কাছে ছিল না।

সে সময় হাদীসগুলো পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করা সম্ভব হয় নি। এমনকি চার ইমামের আবির্ভাবের পরে সমস্ত

হাদীস একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে।

কেননা রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে তারা এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা অন্য প্রান্তের লোকেরা সেখানে না থাকায়, সে হাদীসগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন নি। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা এসব হাদীস সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

আলিমের অধিক জ্ঞান থাকাটা শরীয়াতের সকল দলীল সম্পর্কে জানাকে আবশ্যক করে না।

যেমন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) 'কালালা'[2] এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন। এমন কি রাসূল (ﷺ) এর ইমেন্তেকাল অবধি এর অর্থ বুঝতে তিনি সক্ষম হন নি। রাসূল (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তিনি অনেক বার তাকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং রাসূল (ﷺ) তাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেন নি।

উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি কালালার অর্থ জানার জন্য রাসূল (ﷺ) কে যতবার প্রশ্ন করেছি অন্য ক্ষেত্রে তা করি নি। এমনকি আমার বুকে আঙ্গুল দিয়ে তিনি আঘাতও করেছেন এবং বলেছেন, এর অর্থ বুঝার জন্য ''সূরা নিসার শেষের আয়াত আয়াতুস সইফ তোমার জন্য যথেষ্ট''।

এটি স্পষ্ট বর্ণনা। কেননা মহানাবী (ﷺ) আয়াতে সইফ দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন নিমেণর আয়াতটি-

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

তারা তোমার কাছে সমাধান চায়। বল, ''আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন 'কালালা' সম্পর্কে (সূরা : নিসা-১৭৬)।

অত্র আয়াতটি সুস্পষ্ট ভাবেই কালালার অর্থ বর্ণনা করছে। কেননা তা বর্ণনা করছে যে, কালালা অর্থ যার সন্তান ও পিতা-মাতা নেই।

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ অংশ দ্বারা (দালালাতে মুতাবেকীর মাধ্যমে) কালালার অর্থ নিঃসন্তান বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আবার وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ অংশ দ্বারা (দালালাতে ইলতিযামীর মাধ্যমে) পিতা-মাতা না থাকার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কেননা বোন সম্পদ পাওয়ার জন্য আবশ্যক হলো ভাই নিঃসন্তান হওয়া।

মহানাবী (ﷺ) অত্র আয়াতের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া সত্ত্বেও উমার (রাঃ) তা বুঝতে পারেন নি। উমার (রাঃ) এর পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, কালালার অর্থ বুঝা তার কাছে সর্বদা কঠিন ছিল।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর কাছেও কালালা এর অর্থ অস্পষ্ট ছিল। তিনি কালালার ব্যাপারে বলেন, কালালার অর্থ আমি নিজের রায় থেকে বলছি। যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হল তাহলে তা হবে আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আর তা হলো, যার সন্তান ও পিতা-মাতা নেই। ফলে তার রায় আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়।

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যদি তিনি আয়াতের অর্থ বুঝতেন তাহলে, রায় থেকে বিরত থাকতেন। যেমনটি রাসূল (ﷺ) উমার (রাঃ) কে বলেছিলেন- ''সূরা নিসার শেষের আয়াত আয়াতুস সইফ তোমার জন্য যথেষ্ট''।

এটা হলো মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বর্ণনা যে, আয়াতে জিজ্ঞাসিত বিষয় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, উমার (রাঃ) মহানাবী (ﷺ) এর কাছ থেকে আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে

চেয়েছিলেন। আর প্রয়োজনের সময় ছাড়া পরে বর্ণনা দেয়াটা মহানাবী (ﷺ) এর ক্ষেত্রে বৈধ নয়। সুতরাং যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ দলীল আছে বলেই উমার (রাঃ) আয়াতের উপর নির্ভর করাকে উপযুক্ত মনে করেছেন।

দাদী কতটুকু সম্পত্তি পাবে এ ব্যপারটি আবূ বকর (রাঃ) এর কাছে অস্পষ্ট ছিল। আর মহানাবী (ﷺ) দাদীকে এক ষষ্টাংশ দিয়েছেন। ফলে মুগীরাহ বিন শু‘বা ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা আবূ বকর (রাঃ) কে সংবাদ দিলেন যে, রাসূল (ﷺ) দাদীকে এক ষষ্টাংশ দিয়েছেন। তখন তিনি তাদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

উমার (রাঃ) জানতেন না যে, নাবী (ﷺ) গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্তপণ দাস বা দাসী আযাদ করার বিনিময়ে ফায়সালা দিয়েছিলেন। এ সংবাদ যখন তারা উভয়ে (মুগীরাহ বিন শু‘বা ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা) উমার (রাঃ) কে দিলেন তখন তিনি তাদের কথা গ্রহণ করলেন।

উমার (রাঃ) এটাও জানতেন না যে, স্বামীর দিয়াত বা রক্তপণের অংশে স্ত্রী ওয়ারেস হবে। যখন তাকে যাহহাক ইবনে সুফইয়ান সংবাদ দিলেন, নাবী (ﷺ) তার নিকটে পত্র লিখেছিলেন যে, উশাইম আয-যাবাবী এর স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত বা রক্তপণের অর্থের মীরাস পাবে।

অগ্নি পুজকের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও তিনি জানতেন না। তখন তাকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সংবাদ দিলেন যে, নাবী (ﷺ) বসবাসকারী অগ্নি পুজকদের নিকট হতে জিযিয়া নিতেন।

তিনবার অনুমতি নেয়ার বিধান সম্পর্কেও তিনি জানতেন না। তখন তাকে আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) সংবাদ দিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর জন্য স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে উসমান (রাঃ) জানতেন না। তখন তাকে কুরাইয়া বিনতে মালিক সংবাদ দিলেন যে, নাবী (ﷺ) কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালন করা পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা আবশ্যক করেছেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এ সমস্ত খোলাফায়ে রাশেদাগণ সর্বদা রাসূল (ﷺ) এর সাথে থাকার পরও এবং তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও তাদের কাছে রাসূল (ﷺ) এর অনেক ঘটনা ও হাদীস অজানা থেকে গেছে। ফলে তারা তাদের চেয়ে কম জ্ঞানবান ও মর্যাদাবানদের কাছ থেকেও তা জানার চেষ্টা করেছেন।

সুতরাং, সাহাবাগণ ব্যতীত ইমামগণের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? যারা সাহাবাদের দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেছেন ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং পরবর্তীতে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলের সাহাবাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যারা সেখানে গিয়েছেন।

মোট কথা ইমামগণ শরীয়াতের সকল দলীল ও তার অর্থ জানেন এমনটি ধারণা করা হক্ব থেকে অনেক দূরে এবং নিঃসন্দেহে এটা সঠিক নয়।

এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামের নিকট কিছু হাদীস অজানা থেকে গেছে। ফলে তিনি এ ব্যাপারে জানতে পারেন নি। যা কতিপয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাহাবাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ফলে অন্যের কাছে তা সাব্যাস্ত হয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনি আমল ত্যাগ করার জন্য ওযর প্রাপ্ত। কেননা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কঠোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও

তিনি এ বিষয়ে অবগত হতে পারেন নি। এজন্য তিনি ইজতিহাদের নেকী পাবেন। আর ভুলটা ওযর হিসেবে গণ্য হবে।

কখনও আবার ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত থাকলেও তার নিকটে যে সনদে হাদীসটি পৌঁছেছে তার সনদ দুর্বল। ফলে সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে তিনি হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু অন্যজন একই হাদীসটি অপর এক সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। ফলে তার কাছে হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম জনের হাদীস পরিত্যাগ করার জন্য ওযর রয়েছে। কেননা তিনি দুর্বল সনদটির কথাই জানতে পেরেছেন। আর সহীহ বর্ণনাটি তার কাছে পৌঁছে নি।

কখনও এমন ধারণার ভিত্তিতে হাদীস পরিত্যাগ করেছেন যে, তিনি যে ধারণাটি পোষণ করেন তা হাদীসের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কিন্তু ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে, তার ধারণার চেয়ে হাদীসটিই বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। মূলতঃ তিনি না জানার কারণে এটা করেন, যাতে এর উপর অন্য দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায়। এরূপ অনেক কারণে ইমামগণ কিছু শারঈ দলীলকে পরিত্যাগ করেন।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, শরীয়াতের সকল বিধান ও তার সঠিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে ইমাম অবগত, এমন ধারণা ভ্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক ইমামই এ ধারণাকে বাতিল বলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইনশা আল্লাহ্ এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো, ইমামদের সেই কথার অনুসরণ করা, যা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তারাও ভুল করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হলে সে সব ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাদের (ইমামদের) অনুসারী তারাই যারা কোন কিছুকে কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর প্রাধান্য দেন না। আর যারা কোন ব্যক্তির অভিমতকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়, বরং তারাই তাদের (ইমামদের) বিরোধিতাকারী, তাদের অনুসারী নয়। ইমামগণকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তার দাবীটি নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: মুকাল্লিদগণ ধারণা করে যে, ভুলের জন্য ইমামগণ যেমন ওযর প্রাপ্ত, তারাও তেমন ওযর প্রাপ্ত। এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মুকালিস্নদগণ মনে করে যে, যদি কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম ভুল করেন এবং এ ভুলের যদি তাক্বলীদ করা হয়, তাহলে ভুলের কারণে তারাও ওযরপ্রাপ্ত হবেন এবং যে ইমামের তাক্বলীদ করা হয়েছে তার সমপরিমাণ নেকীও পাওয়া যাবে। কেননা তারা তার (ইমামের) অনুসারী। তাদের প্রতি তাই প্রযোজ্য হবে যা তাদের ইমামের উপর প্রযোজ্য হয়।

নিঃসন্দেহে এ ধারণা মিথ্যা ও বাতিল। কেননা যে ইমামের তাক্বলীদ করা হয়, তিনি কিতাবুলস্নাহ, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ), সাহাবাদের মতামত ও তাদের ফাৎওয়া এর ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নাযিলকৃত ওহীর আলোকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ওহীর জ্ঞান অর্জন করে তার প্রতি আমল করা যে আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে তিনি কার্পণ্য না করে নিষ্ঠার সাথে ইজতিহাদ করেছেন।

অবস্থা এরূপ হলে, তার (ইমামের) ভুলের জন্য তিনি ওযরের উপযুক্ত। আর ইজতিহাদের কারণে নেকী পাওয়ার যোগ্য। আর যারা মুকাল্লিদ তারা কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে নি এবং সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা (কুরআন ও সুন্নাহর) জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে।

আর যে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর সমাধানে ভুলও করে এবং ঠিকও করে এসমস্ত ব্যক্তির মতামতকে তারা (মুকাল্লিদ) গ্রহণ করেছে। সুতরাং তারা যে সমস্ত ইমামের তাক্বলীদ করছে, তাদের অবস্থান কোথায়?

ইমামগণ ও মুক্বালিম্নদের মাঝে এটাই বড় পার্থক্য। এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অন্ধ বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে ভুলের কারণে তারা প্রতিদান পাবে না। কেননা হক্ব বিরোধী বিষয়ে কোন অনুসরণ করা যাবে না এবং এটা কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শও নয়। আর তারা ওযর প্রাপ্তও হবে না। কেননা নাযিলকৃত ওহীর আলোকে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ পালন করা যে তাদের প্রতি আবশ্যক, তারা তা পরিত্যাগ করেছে।

এ জ্ঞান অর্জন করা তাদের উপর ওয়াজিব। প্রয়োজনের দাবী এটাই যে, এ জ্ঞানের উপর আমল করতে হবে। যেমনভাবে শারঈ ইবাদাত বন্দেগী ও পারস্পারিক লেন-দেন (মুয়ামালাত) এর ক্ষেত্রে আমল করা হয়ে থাকে। আর শারঈ দলীল একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কিতাব ও সুন্নাহর সরল জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

মোট কথা, কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত দ্বীন ও রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতের জ্ঞান অর্জনে যে অবহেলা করে এবং কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর যে মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেয়, তিনি অবশ্যই সেই ইমামের মত নন যিনি কিতাবুলস্নাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না, কুরআন-সুন্নাহ’র উপর কোন কিছুকে প্রাধান্য দেন না এবং কিতাব ও সুন্নাহর আদেশ নিষেধের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অবহেলা করেন না। সুতরাং ইমামগণের অবস্থান কোথায় আর তাদের অবস্থান কোথায়?

কবির ভাষায়:

سارت مشرقة وسرت مغربًا * شتان بين مشرق ومغرب

“আমার প্রেয়সী চলে গেছে পূর্ব দিগন্তে আর আমি তার সন্ধানে চলে গেছি পশ্চিম দিগন্তে।

পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মাঝে তো রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।”

ফুটনোট

[1] শানক্বীতী প্রণীত ‘আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৫৩৩-৫৩৯)।

[2] ‘পিতা-মাতাহীন ও নিঃসন্তানকে ‘কালালা’ বলা হয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3124

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন